ইউনিট ৭

বাংলাদেশের সম্পদ ও ঐতিহ্য

পাঠ-১ : মানব সম্পদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- মানবসম্পদ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের উন্নয়নে মানব সম্পদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কোন দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানব সম্পদ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সকল সম্পদের মধ্যে মানব সম্পদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পদ। দক্ষ ও কর্মক্ষম এবং কর্মের সাথে জড়িত মানুষই মূলত মানব সম্পদ। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদ আবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান। দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল ধারায় উন্নতির জন্য মানব সম্পদের ভূমিকা অপরিহার্য। একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদের উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানব সম্পদের কোনো সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা নেই। অন্যান্য সম্পদের ন্যায় মানুষও জাতীয় সম্পদ। কোনো দেশের আয় যেমন তার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল তেমনি মানব উন্নয়ন ছাড়াও তার সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই মানব সম্পদের উন্নয়ন হয়ে থাকে। জনগণের মাঝে গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের নিজের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার বলিষ্ঠ অবদান রাখতে পারে। মানব সম্পদের উন্নয়ন হল উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।

জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল শিক্ষা। শিক্ষার প্রসারে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক সার্বজনীন এবং অবৈতনিক করা হয়েছে। সঠিক শিক্ষা কাঠামো এবং যথাযথ শিক্ষা পদ্ধতি মানব সম্পদ উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এ কারণে ২০১৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার অঙ্গীকার এ প্রেক্ষাপটে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে আসছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং ছাত্র-ছাত্রীর হার নিম্নরূপ (সারণি-১)।

সারণি-১: প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি (২০০০-২০১০) (লক্ষে)

সাল	মোট	ছাত্র(%)	ছাত্রী(%)
২০০০	১৭৬.৬৮	৫১.১০	৪৮.৯০
২০০১	১৭৬.৫৯	৫১.০০	৪৮.০০
২০০২	১৭৫.৬২	৫০.৩০	৪৯.৭০
২০০৩	১৮৪.৩১	৫০.৮০	৪৯.২০
২০০৪	১৭৯.৫৩	৫০.৪০	৪৯.৬০
২০০৫	১৬২.২৫	৪৯.৮৭	৫০.১৩
২০০৬	১৬৩.৮৬	৪৯.৬২	৫০.৩৮
২০০৭	১৬৩.১৩	৪৯.২৬	৫০.৭৪
২০০৮	১৬৭.৪৯	৪৯.৭০	৫০.৩০
২০০৯	১৬৫.৩৯	৪৯.৮৩	৫০.১৭
২০১০	১৬৯.৫৮	৪৯.৫০	৫০.৫০

উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১২

অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই ও গতিশীল করার জন্য মানব সম্পদের ভূমিকা অপরিহার্য। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে অতি অল্প সময়ে জনসম্পদে পরিণত করা যায়। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে অল্পশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের একটি বিশেষ পেশায় প্রশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এক্ষেত্রে বেসরকারির চেয়ে সরকারি ভূমিকা অগ্রাধিকার পাবে। বিশেষ করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা রাখার সুযোগ পাবে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। অন্যদিকে সরকার জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হল- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্পের যৌথ উদ্দ্যোগে ইউনিয়ন পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্ড়বভিত্তিক কম্পিউটার ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা ট্রেড ভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এই ট্রেড গুলোর মধ্যে হালকা ও ভারী ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রনিক্স হালকা মেশিনারিজ সারানো ইত্যাদি। অল্পদিনের প্রশিক্ষণেই দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠে এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সর্বশেষ জরিপ (Labour Force Survey-2010) অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সংখ্যা ৫.৬৭ কোটি এর মধ্যে ৫.৪০ কোটি শ্রমশক্তি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যুবসমাজ। এই যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য ১৯৮১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ৩৬.৮৮ লক্ষ যুবক ও যুব মহিলাকে দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল দক্ষ নাগরিকে পরিণত করার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিদেশে গমনেচ্ছু ডাক্তার, নার্স ও বেকারদের জন্য আরবি, ইংরেজি, কোরিয়ান ও মালয় ভাষায় কথা বলার দক্ষতা প্রদানের নিমিত্তে দেশের ১১টি আধুনিক ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এছাড়া শ্রমশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক দেশের ২৬টি জেলায় মহিলাদের জন্য ৬টিসহ ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা (রেমিট্যান্স) আয় করে থাকে। বাংলাদেশ মূলত ৩-৬ মাসের ট্রেনিং দিয়ে জনশক্তি বিদেশে রপ্তানি করে থাকে। এ ধরনের প্রশিক্ষণের জন্য দেশে ৩৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতিতে জনগণকে শিক্ষিত করার কথা বলা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিদেশে কর্মরত শ্রমশক্তির বেশির ভাগই মধ্যপ্রাচ্যে। শ্রমশক্তি রপ্তানি এবং বিদেশে কর্মরতদের প্রেরিত অর্থ বিনিয়োগের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। বিগত কয়েক বছরের প্রবাসী কর্মচারীর সংখ্যা এবং প্রেরিত রেমিটেন্স নিম্নরূপ (সারণি-২)।

সারণি-২: প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবির, সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	কর্মজীবির সংখ্যা (০০০) (হাজার)	প্রেরিত অর্থ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০০২-০৩	২৫১	৩,০৬১.৯৭
২০০৩-০৪	২৭৭	৩,৩৭১.৯৭
২০০৪-০৫	২৫০	৩,৮৪৮.২৯
২০০৫-০৬	২৯১	৪,৮০১.৮৮
২০০৬-০৭	৫৬৪	৫,৯৭৮.৪৭
২০০৭-০৮	৯৮১	৭,৯১৪.৭৮
২০০৮-০৯	৬৫০	৯,৬৮৯.১৬
২০০৯-১০	৪২৭	১০,৯৮৭.৪০
২০১০-১১	৪৩৯	১১,৬৫০.৩২

উৎস: বাংলাদেশ অথনৈতির্ক সমীক্ষা-২০১২

বাংলাদেশ থেকে পেশাজীবি, দক্ষ, আধা দক্ষ, স্বল্পদক্ষ জনশক্তি বিদেশে রপ্তানি করা হয়। স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি মোট জনশক্তি রপ্তানির ৫০ শতাংশের বেশি (সারণি-৩)।

সারণি-৩: শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

সাল	পেশাজীবি	দক্ষ	আধা-দক্ষ	স্বল্পদক্ষ	মোট
২০০২	১৪,৪৫০	৫৬,২৬৫	৩৬,০২৫	১,১৮,৫১৬	২,২৫,২৫৬
২০০৩	১৫,৮৬২	৭৪,৫৩০	২৯,২৩৬	১,৩৬,৫৬২	২,৫৪,১৯০
২০০৪	১৯,১০৭	৮১,৮৮৭	২৪,৫৬৬	১,৪৭,৩৯৮	২,৭২,৯৫৮
২০০৫	১,৯৪৫	১১,৩,৬৫৫	২৪,৫৪৬	১,১২,৫৫৬	২,৫২,৭০২
২০০৬	৯২৫	১,১৫,৪৬৮	৩৩,৯৬৫	২,৩১,১৫৮	৩,৮১,৫১৬
২০০৭	৬৭৬	১,৬৫,৩৪৪	১,৮৩,৭৫৪	৪,৮২,৮৩৫	৮,৩২,৬০৯
২০০৮	১,৮৬৪	২,৮১,৪৪৪	১,৩২,৮১০	৪,৪৭,৩৩৮	৮,৭৫,০৫৫
২০০৯	১,৪২৬	১,৩৪,২৬৫	৭৪,৬০৪	২,৫৫,০৭০	৪,৭৫,২৭৮
২০১০	৩৮৭	৯০,৬২১	১২,৪৬৯	২,৮৭,২২৫	৩,৯০,৭০২
২০১১	১,১৯২	২,২৯,১৪৯	২৮,৭২৯	৩,০৮,৯৯২	৫,৬৮,০৬২

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১২

বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের জনশক্তির বেশ কদর রয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। এছাড়াও ওমান সিঙ্গাপুর, কাতার ও বাহরাইনসহ আরো অনেক দেশে জনশক্তি রপ্তানি হয়ে থাকে। ২০১২ এর জানুয়ারি-জুলাই এ রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ৬৫ হাজার ৫৩২ কোটি টাকা যা পূর্বের বছরের একই সময়ে ছিল ৫১ হাজার ৬৫৮ কোটি টাকা। বাংলাদেশ প্রধানত চারটি ক্যাটাগরিতে জনসংখ্যা রপ্তানি করে থাকে। যথা- প্রফেশনাল, স্কিল্ড, সেমি স্কিল্ড ও লেস স্কিল্ড। বিদেশে প্রশিক্ষিত জনসংখ্যার চাহিদা বেশি। তাই সরকারকে এদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে পারে। বাংলাদেশের জিডিপিতে ৭ ভাগেরও বেশি অবদান জনশক্তি খাতের। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রশিক্ষিত সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী জাতিসংঘের হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

পাঠ সংক্ষেপ

সকল সম্পদের মধ্যে মানব সম্পদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পদ। জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল শিক্ষা। শিক্ষার প্রসারে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া কারিগরি শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে কারিগরি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। পেশাজীবি, দক্ষ, আধা-দক্ষ জনশক্তি বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। এ সকল প্রবাসী প্রচুর পরিমাণে রেমিটেন্স প্রেরণ করে যা দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে। দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই মানব সম্পদের উন্নয়ন হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৭.১

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. মানব সম্পদ বলতে কি বুঝায়?
২. জনসংখ্যাকে কিভাবে মানব সম্পদে পরিণত করা যায়?
৩. কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা কি ধরনের ভূমিকা রয়েছে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের উন্নয়নে মানব সম্পদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

পাঠ-২ : খনিজ সম্পদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- খনিজ সম্পদ কি তা জানতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের বিভিন্ন খনিজ সম্পদ সম্পর্কে জানবেন।

বাংলাদেশ মূলত বঙ্গীয় অববাহিকায় অবস্থিত। দেশের ১২ ভাগ এলাকা টারশিয়ারী, ৮ ভাগ এলাকা প-াইষ্টোসিন এবং ৮০ ভাগ এলাকা হলোসিন যুগে গঠিত। টারশিয়ারী এলাকা বলতে মূলত দেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাংশের এলাকাকে বুঝায়। প্লাইষ্টোসিন হল- উত্তর-পশ্চিম, মধ্য উত্তর ও মধ্য পশ্চিমাংশ। অবশিষ্ট ৮০ ভাগ হলোসিন যুগে গঠিত যা মূলত নদী অববাহিকা। খনিজ সম্পদের অবস্থান মূলত ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশে যেসব খনিজ পাওয়া যায় তা হল প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, কঠিন শিলা, নুড়িপাথর, গন্ডশিলা, কাঁচবালি, বালু, চীনামাটি, পিট, সৈকত বালির ভারী মানিক ইত্যাদি। সাধারণভাবে টারশিয়ারী সময়কালের এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেল, প-াইষ্টোসিন সময়কালের এলাকায় চীনামাটি এবং হলোসিন সময়কালে গঠিত এলাকায় নুড়ি পাথর, কাচবালি, সৈকত বালি, পিট পাওয়া যায়।

তেল ও গ্যাস: বাংলাদেশে এ পর্যন্ড় মোট ২২টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। গ্যাসের মজুদ প্রায় ২৫ TCF, দেশের অধিকাংশ খনির গ্যাস শুষ্ক গ্যাস, এতে করে কনডেনসেটের উপস্থিতি সামান্য। দেশে বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রায় ৭০ ভাগই গ্যাস দ্বারা পূরণ করা হয়। সবচেয়ে বেশি গ্যাস ব্যবহার করা হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে। এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৪৪ ভাগ, সার শিল্পে ২৮ ভাগ, গৃহস্থালি, বানিজ্যিক ও অন্যান্য কাজে ২২ ভাগ গ্যাস ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দৈনিক গ্যাস উত্তোলনের পরিমাণ প্রায় ৯০০-৯৩০ মিলিয়ন ঘনফুট। বাংলাদেশে একমাত্র তেলকুপ সিলেটের হরিপুরে অবস্থিত। ১৯৮৬ সালে এই তেলক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়। এখানে প্রায় ৬ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উত্তোলনযোগ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। ১৯৮৭ সাল থেকে উত্তোলন শুর" করলেও ১৯৯৪ সাল হতে এখান হতে তেল উত্তোলন স্থগিত রয়েছে। সম্প্রতি কৈলাশটিলায় তেলবাহী শিলাস্ড়রের সন্ধান পাওয়া গেছে।

কয়লা: বাংলাদেশে মোট কয়লাখনির সংখ্যা ৫টি, যার মধ্যে চারটি বাংলাদেশ সরকারি সংস্থা (জিএসবি) কর্তৃক আবিস্কৃত এবং অন্যটি বি-এইচ পি মিনারেলস কর্তৃক আবিস্কৃত। দেশের সকল কয়লা খনিই দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। এ পর্যন্ড় আবিস্কৃত কয়লা খনির মধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির আকার সবচেয়ে বড়। এখানে আনুমানিক ৬৪ মিলিয়ন টন উত্তোলনযোগ্য কয়লা আছে বলে ধারণা করা হয়। বছরে ১ মিলিয়ন টন করে উত্তোলনের লক্ষ্যে ৬৪ বছরের জন্য এই খনি কার্যকর থাকবে। এখান থেকে উৎপাদিত কয়লার একটি বড় অংশ নিকটবর্তী ৩০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়।

চুনাপাথর: ১৯৬০ এর দশকে পাকিস্তান জিওলজিক্যাল সার্ভে (জিএসপি) জয়পুরহাট জেলায় ভূ-পৃষ্ঠের ৫১৫-৫৫৪ মিটার গভীরতায় একটি চুনাপাথরের খনি আবিস্কার করে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর জিএসবি ১৯৯০ এর দশকে নওগাঁর দুটি এলাকায় চুনাপাথরের মজুদ আবিস্কার করে। এছাড়া সিলেট জেলার জাফলং ও জকিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ জেলার লালঘাট, টাকেরহাট, বাগালিবাজার ও ভাঙ্গারঘাট, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড এবং কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনে চুনাপাথর পাওয়া যায়। চুনাপাথর সিমেন্ট তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়।

কঠিন শিলা: বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর দিনাজপুরের মধ্যপাড়া নামক স্থানে কঠিন শিলার মজুদ আবিস্কার করেছে। ভূ-পৃষ্ঠের ১৩২ মিটার হতে ১৬০ মিটার গভীরতায় এই শিলার অবস্থান। এই খনির বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১৬৫ মিলিয়ন টন। এই খনির উন্নয়ন কাজে উত্তর কোরিয়ার সরকার সহায়তা করছে। এখানে গ্রানোডায়োরাইট, কোয়ার্টজ, ডয়োরাইট, নিস ইত্যাদি কঠিন শিলা পাওয়া যায়।

পিট: বাংলাদেশের মোট পিটের মজুদের পরিমাণ ১৭ কোটি টনের বেশি। দেশের উত্তর-পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাভূমিতে পিটের মজুদ লক্ষ্য করা যায়। দেশীয় পিটের তাপোৎপাদক মান পাউন্ড প্রতি ৬০০০-৭০০০ বিটি ইউ। বিশেষ করে গৃহ জ্বালানি, ইটের ভাটায় পিটের ব্যবহার হয়ে থাকে।

ধাতব খনিজ: বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর অনুসন্ধান চালিয়ে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ হতে চ্যালকো পাইরাইট, বোনাইটন, চ্যালকোসাইট, কোভেলাইন গ্যালেনার মতো ধাতব খনিজের অস্ড়িত্ব পেয়েছে।

চীনামাটিঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে চীনামাটির উল্লেখযোগ্য মজুদ রয়েছে। যার মধ্যে নেত্রকোনা জেলার বিজয়পুর, শেরপুর জেলার ভুরংগা, চট্টগ্রাম জেলার হাইটগাও, কাঞ্চপুর, এলাহবাদ এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় চীনামাটির মজুদ রয়েছে। চীনামাটি মূলত কেরোলিন কাদা মানিক যা সিরামিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

কাঁচবালিঃ বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কাঁচবালির মজুদ রয়েছে, যার মধ্যে বালিজুড়ীতে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার টন, শাহজিবাজারে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার টন ও চৌদ্দগ্রামে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টন কাঁচবালি রয়েছে। দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় ভূ-অভ্যন্ড়রে মধ্যপাড়ায় ১ কোটি ৭২ লক্ষ টন ও বড়পুকুরিয়াতে ৯ কোটি টন কাঁচবালির মজুদ রয়েছে। কাঁচবালি মূলত সুক্ষ্ম থেকে মাঝারি আকারের কোয়ার্টজ, যা হলুদ থেকে ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে।

সৈকত বালিঃ বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায়, বিশেষ করে উপকূলীয় বলয় এবং দ্বীপসমূহে সৈকত বালি পাওয়া যায়। দেশের সৈকত বালিতে নানা ধরনের ভারী মানিকের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে জিরকন, রুটাইল, ইলমেনাইট, কায়ানাইট অন্যতম।

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে অন্যতম হল প্রাকৃতিক গ্যাস। এছাড়া তেল, কয়লা, চুনাপাথর, কঠিন শিলা, ধাতব খনিজ, চীনামাটি ইত্যাদি খনিজ সম্পদ সামান্য পরিমাণে রয়েছে। বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর বিভিন্ন স্থানে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.২

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. বাংলাদেশের গ্যাসের ব্যবহার উল্লেখ করুন।
২. বাংলাদেশের কোথায় কোথায় চুনাপাথর পাওয়া যায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের বিবরণ দিন।

পাঠ-৩ : পানি ও মৎস্য সম্পদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- পানি ও মৎস্য সম্পদ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের উন্নয়নে পানি ও মৎস্য সম্পদের ভুমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মৎস্য কৃষি খাতের একটি অন্যতম খাত। জাতীয় উন্নয়নে মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবেই দেশের নদী-খাল, হাওড়, বাওড়, বিল, হ্রদ ও বিভিন্ন জলাভূমিতে স্বাদু পানির মাছের বসবাস। ২০১১-১২ অর্থ বছরে জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ১.৬৯%। প্রাণিজ আমিষের ৬০ ভাগ আসে মাছ থেকে এবং প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য সম্পদের সাথে জড়িত। অবকাঠামো তৈরি ও ভূমি সংস্কারের ফলে দেশে জলাধারের আয়তন ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। ষাটের দশকে দেশে প্লাবনভূমি ছিল প্রায় ৬ লক্ষ হেক্টর, ১৯৮৫ সালে ছিল প্রায় ৫৪ লক্ষ হেক্টর এবং আশির দশকের শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ২৮ লক্ষ হেক্টরে। ফলে দেশে মৎস্য সম্পদের পরিমাণ ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে। নিম্নে মৎস্য খাতের বিভিন্ন খাতের আয়তন উল্লেখ করা হলো (সারণি-১)।

সারণি-১: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎসের আয়তন

	মৎস্য খাতের উৎস	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)
ক. মুক্ত জলাশয়	নদী ও মোহনা	৮.৫৩
	সুন্দরবন	১.৭৭
	বিল	১.১৪
	কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯
	প্লাবন ভূমি	২৮.১০
খ. চাষকৃত	পুকুর	৩.৫১
	হাওড়	০.০৯
	অর্ধ আবদ্ধ	০.২২
	চিংড়ি খামার	২.৪৬
মোট		**৪৬.৫২**

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১২

বাংলাদেশে সামুদ্রিক এবং স্বাদু পানি-দুই ধরনের মাছই পাওয়া যায়। নানাবিধ কারণে প্রাকৃতিক মুক্ত জলাশয়ে মাছের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। দেশে বিগত কয়েক বছরের উৎপাদিত মৎস্যের পরিমাণ তুলে ধরা হলো (সারণি-২)।

সারণি-২: মৎস্য উৎপাদন

অর্থবছর	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)
২০০৫-০৬	২৩.২৯
২০০৬-০৭	২৪.৪০
২০০৭-০৮	২৫.৬৩
২০০৮-০৯	২৭.০১
২০০৯-১০	২৮.৯৯
২০১০-১১	৩০.৬২

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১২

বাংলাদেশে একমাত্র সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকা হলো বঙ্গোপসাগর। মোট তিনটি অংশে বিভক্ত আহরণ ক্ষেত্রটির আয়তন প্রায় ৭০,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ। ১৯৮৬ সালে ল্যাম্বোভ বঙ্গোপসাগরের গভীরতার ভিত্তিতে মৎস্য সম্পদের হিসাব নিরূপন করেন। এখানে তিনি ১৯টি প্রধান দলের সামুদ্রিক মাছের জীববস্তু নির্ণয় করেছে (সারণি-৩)।

সারণি-৩: সামুদ্রিক মাছের জীববস্তু ও ঘনত্ব

গভীরতার (মি)	জীববস্তু (%)	মাছের ঘনত্ব (বর্গকিমি/টন)
১০-২০	৩৬	৮.১
২০-২৫	২৮	৬.৫
৫০-৮০	২২	৪.১
৮০-১০০	২২	২.৯

উৎস: বাংলাপিডিয়া (২০০৪)

আহরিত সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতিগুলো হল-ক্যাটকিস, পোয়া, রূপবান, ম্যাকরেল, সোনালী বাটা। ১৯৯২-৯৩ হিমায়িত সামুদ্রিক মৎস্য রপ্তানির মাধ্যমে ১৬.৫৩ কোটি মার্কিন ডলার এবং মৎস্যজাত পণ্য থেকে আরো প্রায় ১ কোটি মার্কিন ডলার আয় হয়।

বাংলাদেশের মোহনায় উৎপাদিত মৎস্য সম্পদ হল চিংড়ি। যদিও চিংড়ি স্বাদু পানিতেও পাওয়া যায়। নদীর মোহনায় ও স্বল্পলোনা পানিতে গলদা ও বাগদা উভয় ধরনের চিংড়ি পাওয়া যায়। ২০০৬ সালে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হয়। সাতক্ষীরা, খুলনা কক্সবাজার ও টেকনাফ অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে। সাধারণভাবে লোনা পানিতে বাগদা এবং স্বল্পলোনা পানিতে গলদা চিংড়ির চাষ করা হয়ে থাকে। মূলত ঘের করে চিংড়ি চাষ করা হয়।

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই প্রাকৃতিক জলাভূমি বিল রয়েছে। কিছু কিছু বিলে সারা বছর পানি থাকে, তবে অধিকাংশ বিল শীতকালে শুকিয়ে যায়। দেশে মোট বিলের সংখ্যা প্রায় ৪৫০০ যার মোট আয়তন প্রায় ১১,৪১,১৬১ হেক্টর। নদীর তুলনায় বিল থেকে বেশি মাছ আহরিত হয়ে থাকে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৬.৮৮% আসে বিল থেকে। বিলগুলো সাধারণত উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে ইজারা দেওয়া হয়। বিলে যেসব প্রজাতির মাছ পাওয়া যায় তার মধ্যে উলে-খযোগ্য হল- মলা, কই, শোল, টাকি, খৈলসা, টেংরা, আইর, পুটি ইত্যাদি। তবে কোনো কোনো বিলে কার্প জাতীয় মাছও পাওয়া যায়।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

বাংলাদেশ থেকে হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, হংকং, সিংগাপুর, সৌদি আরব, সুদান প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ০.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ০.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে যথাক্রমে ৩২৭৪ কোটি এবং ৩৪০৮ কোটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়। ২০১০-১১ অর্থ বছরে মৎস্য আহরণের পরিমাণ ২৮.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল ধ্বংস করা হচ্ছে। ফলে মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস হচ্ছে এবং মজুত দিন দিন কমে যাচ্ছে। তবে আশার বিষয় হলো- বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পানি সম্পদ

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-পৃষ্ঠস্থ উভয় ধরনের পানির উৎস রয়েছে। এখানে পানিপ্রবাহ ঋতুভিত্তিক হয়ে থাকে। বর্ষাকালে প্রায় ১,৪০,০০০ কিউসেক এবং শীতকালে প্রায় ৭০,০০০ কিউসেক পানি প্রবাহিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে পানি সম্পদের উৎসসমূহ হলো- (ক) নদী-নালা ও খাল বিল (খ) প্লাবনভূমি (গ) জলাভূমি (ঘ) হাওড় ও বাওড় (ঙ) পুকুর (চ) জোয়ার প্লাবিত জমি এবং (ছ) ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর।

বাংলাদেশের উপর দিয়ে অনেক পানি প্রবাহিত হলেও বেশ কিছু জটিলতার কারণে এই পানির সীমিত অংশই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দেশে ভূ-পৃষ্ঠের পানির সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না। শুকনো মৌসুমে ব্যবহারের জন্য তেমন কোন জলাধার নির্মাণ করা হয়নি। উপরন্তু সেচ এবং অন্যান্য কাজে পানির চাহিদা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পানির চাহিদা ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাধ্যমে মেটানো হচ্ছে যার ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির টেবিল ক্রমান্বয়ে নীচে নামছে। ফলে দেশে

ভবিষ্যতে প্রচুর পানি সংকট দেখা দেওয়া আশংকা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের ভূ-পৃষ্ঠের পানির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমাতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

জাতীয় উন্নয়নে মৎস্য ও পানি সম্পদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। নদীপ্রধান এদেশে হাওড়, বাওড়, হ্রদসহ অসংখ্য জলাশয় রয়েছে যা মৎস্যের আধার হিসেবে পরিচিত। প্রাণিজ আমিষের ৬০ ভাগ আসে মাছ থেকে। এদেশে স্বদু ও লোনা উভয় প্রকার পানির মাছ পাওয়া যায়। স্বাদু পানির মাছের মধ্যে রয়েছে- কৈ, মলা, কই, শোল, টাকি, খৈলসা, টেংরা, আইর, পুটি ইত্যাদি। সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতিগুলো হল-ইলিশ, ক্যাটকিস, পোয়া, রূপবান, ম্যাকরেল, সোনালী বাটা ইত্যাদি। এদেশের উপর দিয়ে অনেক পানি প্রবাহিত হলেও তা বিভিন্নভাবে অপব্যবহার হচ্ছে। ফলে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিতে পারে। তাই ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৭.৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. বাংলাদেশের মৎস্যের উৎসসমূহ কি কি?
২. চিঙড়ি মাছ কোন অঞ্চলে পাওয়া যায়?
৩. পানি সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের বিবরণ দিন।

পাঠ-৪ : বন ও বনজ সম্পদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- বন ও বনজ সম্পদ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের উন্নয়নে বন ও বনজ সম্পদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের নিকটবর্তী অঞ্চলের মায়োসিন স্ড়রে প্রাপ্ত জীবাশ্ম গবেষণা করে দেখা যায় যে, টারশিয়ারী যুগে বাংলাদেশের অংশবিশেষ গ্রীষ্মমন্ডলীয় অরণ্যে ঢাকা ছিল। টারশিয়ারী যুগের পর প-াইস্টোসিন যুগে হিম যুগ এবং আন্ড়হিম যুগের জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে উদ্ভিদকূলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। সভ্যতার বিকাশে বনভূমির অবদান ব্যাপক। রামায়ন ও মহাভারত সাহিত্যকর্মে গঙ্গা নদীর তীরে গভীর বনের কথা উলে-খ্য রয়েছে। এখানে বাংলাদেশের সাধারণ বনবৃক্ষ শাল, বেল, কিংশুক প্রভৃতির উলে-খ আছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ১.৬০ মিলিয়ন হেক্টর। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ১.৪০ মিলিয়ন হেক্টর যা বন অধিদপ্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অবশিষ্ট প্রায় ০.২০ মিলিয়ন উপকূলীয় বনায়ন। এছাড়া দেশের সর্বত্র প্রায় ০.৭৭ মিলিয়ন হেক্টর বসত বাড়ী এবং প্রান্ড়িক পতিত ভূমি বৃক্ষাচ্ছদনে আবৃত।

বনভূমির প্রকারভেদ

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের বন বিভাগ দেশের সমগ্র বনভূমিকে মোট তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে। এগুলো হল– (১) গরান বনভূমি (২) মিশ্র চিরহরিৎ এবং (৩) শালবন। এছাড়াও বাস্তুসংস্থানিক ভিত্তিতে ৫ ধরনের বনভূমি বাংলাদেশে দেখা যায়। যথা– (১) ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরসবুজ (২) ক্রান্ড়ীয় আধা-চিরসবুজ (৩) ক্রান্তীয় আর্দ্র পত্রমোচী (৪) জোয়ারধৌত এবং (৫) কৃত্রিম বনভূমি।

১. ক্রান্ড়ীয় আর্দ্র চিরসবুজ বন

এই বনের গাছপালা সারাবছরই চিরসবুজ থাকে। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বন এটি। অল্প পরিমাণে আধা চিরসবুজ এবং পত্রমোচী বৃক্ষ থাকলেও তাতে এই বনের প্রকৃতির উপর কোনো প্রভাব পড়ে না। চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম, দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের কক্সবাজার, উত্তর পূর্বাঞ্চলের মৌলভীবাজারে এই বনের অবস্থান। এখানে বৃক্ষের উচ্চতা ৪৫-৪৬ মিটার হয়ে থাকে। এই বনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বৃক্ষের স্তর। উচ্চতার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার উদ্ভিদ ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় ছাউনির সৃষ্টি করে। এখানে প্রায় ৭০০ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ রয়েছে। কলিগর্জন, ধলিগর্জন, কামদেব, রক্তন ইত্যাদি চিরহরিৎ বৃক্ষ ছাড়াও চাপা, চাপালিশ, তেলসুর, ময়না ইত্যাদি অধি চিরহরিৎ বৃক্ষ বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। এখানে নগ্নবীজী উদ্ভিদ ও বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ পাওয়া যায়। আর্দ্র ছায়াযুক্ত স্থানে পরাশ্রয়ী অর্কিড জন্মে থাকে।

২. ক্রান্ড়ীয় আধা-চিরসবুজ বন

এখানে চিরহরিৎ উদ্ভিদ থাকলেও পত্রমোচী বৃক্ষের আধিক্য দেখা যায়। এই বনভূমি এলাকা সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম কক্সবাজার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দিনাজপুর নিয়ে গঠিত। এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জুম চাষ। আট শতাধিক সপুষ্পক উদ্ভিদ পাওয়া যায়। বৃক্ষের উচ্চতা ২৫-২৭ মিটার হয়ে থাকে। চাপালিশ, তেলশুর, নারকেলি প্রজাতিগুলোই এখানে বেশি বেশি জন্মাতে দেখা যায়। উচু স্তরে বনশিমূল, শিলকড়ই ও পীতজাম, মধ্যাঞ্চলে ঢাকিজাম, নীচুস্ড়রে অশোক জলপাই এবং নিম্নস্ড়রের ডেফল, কচুয়া উদ্ভিদ জন্মে। চিরসবুজ উদ্ভিদের মধ্যে গর্জন, শিমুল, করই প্রধান। এই বনভূমি,থেকে মূলত বাণিজ্যিক কাঠের যোগান আসে। মোট আয়তন প্রায় ৬,৪০,০০০ হেক্টর। সাম্প্রতিক সময়ে এখানে রাবার চাষ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

৩. ক্রান্ড়ীয় আর্দ্রপত্রমোচী বন

এই বন সাধারণভাবে শালবন নামে পরিচিত। এই বনভূমির আয়তন প্রায় ১,০৭,০০০ হেক্টর। এখানে দুটি ভাগে বনভূমির বিস্ড়র লক্ষ্য করা যায়। বৃহৎ অংশটি যমুনা ও ব্রক্ষপত্র মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং দ্বিতীয় অংশ শেরপুর জেলার গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কুমিল্লা হতে ভারতের দার্জিলিং পর্যন্ত নিরবছিন্নভাবে এই বনের অবস্থান ছিল। বর্তমানে ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর ও কুমিল্লা এলাকায় এই ধরনের বনভূমি দেখা যায়। তবে রংপুর, ঠাকুরগাঁও ও নওগাঁ অঞ্চলে বিভিন্নভাবে এই ধরনের বনভূমির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই বনভূমির অধিকাংশই বেদখল হয়ে গেছে। এখানে বনভূমির ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর ধানক্ষেত দেখা যায়। এই বনে শাল বৃক্ষ শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ। তবে পলাশ, জারুল, শেওড়া বহেড়া ইত্যাদি বৃক্ষও লক্ষ্য করা যায়।

৪. জোয়ার ধৌত বন

উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে খুলনা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই ধরণের বনভূমি দেখা যায়। এর আয়তন প্রায় ৫,২০,০০০ হেক্টর। চির সবুজ গাছগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর শ্বাসমূল। এই বনভূমি জোয়ারের সময় সাগরের লবনাক্ত পানিতে প্লাবিত হয়। সুন্দরী এই ধরনের বনভূমির প্রধান বৃক্ষ। তবে গেওয়া, কেওড়া, গোলপাতা প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে।

৫. কৃত্রিম বন

এটি মানব সৃষ্ট বন। রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় এই ধরনের বনভূমি এলাকা গড়ে উঠে।

বনজ সম্পদ ও ব্যবহার

একটি দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা আবশ্যক। বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৬ লক্ষ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৮ ভাগ। দেশে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বনাঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ২২ লক্ষ ২৪ হাজার হেক্টর। এখানে প্রতি বছর ২.১% হারে বনভূমি ধ্বংস হয়ে থাকে। গৃহ নির্মাণ এবং জ্বালানির মূল উৎস বনভূমি। ১৯৭০ সালে মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ ছিল ০.০৩৫ হেক্টর যা ২০০৬ সালে ছিল ০.০১৮ হেক্টর।

বাংলাদেশে বনজ সম্পদের প্রধান প্রধান ব্যবহারগুলো নিম্নরূপ:

(১) গৃহনির্মাণ ও নির্মাণ সামগ্রী (২) আসবাবপত্র (৩) কাগজপত্র শিল্প (৪) জ্বালানী কাঠ (৫) কৃষি উন্নয়ন (৬) পরিবহন ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কাঠজাত দ্রব্য ছাড়াও বনভূমি থেকে নানা অকাঠ জাত দ্রব্য আহরণ করা হয়। নিম্নে চলতি মূল্যে বনজসম্পদের দেশজ উৎপাদন উল্লেখ করা হলো (সারণি-১)।

সারণি-১: চলতি মূল্যে বনজসম্পদের দেশজ উৎপাদন

অর্থবছর	চলতি মূল্য (কোটি টাকা)
২০০১-০২	৪,৯৮৯
২০০২-০৩	৫,৩০০
২০০৩-০৪	৫,৬২০
২০০৪-০৫	৬,০০৬
২০০৫-০৬	৬,৪২৩
২০০৬-০৭	৬,৮৭৬
২০০৭-০৮	৭,৫০৫
২০০৮-০৯	৮,১৭৭
২০০৯-১০	৯,০৩০
২০১০-১১	৮,৭৭৪

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১২

জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্যের জন্য বাংলাদেশে অতি দ্রুত বন উজার হচ্ছে। বসতি স্থাপন, কৃষি কাজ, শিল্প স্থাপন ইত্যাদি কারণে দেশে দ্রুত বনভূমি উজার হয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। বনভূমি দেশের আর্থিক ও সার্বিক কল্যাণে ভূমিকা রাখে। বনভূমি রক্ষার্থে ১৯৮৯ সালে থেকে সরকার প্রাকৃতিক বনে বৃক্ষ নিধনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এছাড়া উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই সব এলাকায় ব্যাপক বনায়ন হচ্ছে। এছাড়াও ১৯৯৭ সালে প্রথম জাতীয় বননীতি করা হয়। ১৯৯৪ সালে একটি নতুন বননীতি গৃহীত হয় যাতে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বনভূমি এলাকা ১০ হতে ২০ ভাগ বৃদ্ধি, ১০ ভাগ রির্জাভ বন সংরক্ষণ করা এবং সামাজিক বনায়ন ও কৃষি বনায়ন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশে প্রায় ১.৬০ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি রয়েছে। এই বনভূমি দেশের সর্বত্র সমানভাবে বন্টিত নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সুন্দরবন এলাকায় অধিক বনভূমি রয়েছে। এদেশের বনভূমিকে বনবিভাগ কর্তৃক ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-(১) গরান বনভূমি (২) মিশ্র চিরহরিৎ এবং (৩) শালবন। এছাড়াও বাস্তুসংস্থানিক ভিত্তিতে ৫ ধরনের বনভূমি বাংলাদেশে দেখা যায়। যথা– (১) ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরসবুজ (২) ক্রান্ড়ীয় আধা-চিরসবুজ (৩) ক্রান্ড়ীয় আর্দ্র পত্রমোচী (৪) জোয়ারধৌত এবং (৫) কৃত্রিম বনভূমি। বনভূমিগুলোর প্রধানবৃক্ষ শাল, শিমুল, কড়ই, সুন্দরী, পলাশ, জারুল, শেওড়া, বহেড়া ইত্যাদি বৃক্ষ অন্যতম। বনভূমি থেকে সম্পদ কাঠ ও জ্বালানি চাহিদা পূরণ করে। এছাড়া বিপুল সংখ্যক লোক এ শিল্পে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৭.৪

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. বাংলাদেশের বনভূমি কত প্রকার ও কি কি?

২. বাংলাদেশের বনজ সম্পদের প্রধান ব্যবহারগুলো কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের বনভূমি বিবরণ দিন।

পাঠ-৫ : ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- ঐতিহাসিক স্থাপনা কি তা জানতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের কতিপয় ঐতিহাসিক স্থাপনা সম্পর্কে জানবেন।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ আদি ঐতিহাসিক এবং আদি মধ্যযুগের। এখানে মূলত হিন্দু, বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যার মধ্যে নওগাঁর পাহাড়পুর, বগুড়ার মহাস্থানগড় এবং কুমিল্লার ময়নামতি উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি স্থাপনা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে বিশেষায়িত।

পাহাড়পুর

নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত বিহারটি সোমপুর বিহার নামে পরিচিত। এখানে ১৯২৫ সাল হতে শুরু করে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত খনন কাজ হয়। এই খনন কাজ পরিচালনা করে আকিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া। পাহাড়পুরের মন্দিরগুলোর নির্মাতা ছিলেন পাল রাজা ধর্মপাল (আনুমানিক ৭৮১-৮২১ খ্রিস্টাব্দ)। পাহাড়পুর মূলত মধ্য যুগের বাংলার স্থাপনা ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করে। এখানে উলে- খযোগ্য পরিমাণ পাথরের ভাস্কর্য ও পোড়ামাটির ফলক পাওয়া যায়। ভাস্কর্য হতে ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পোড়ামাটির ফলক হতে তখনকার মানুষের জীবনচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। পাহাড়পুরে কিছু ব্রোঞ্জ নির্মিত ক্ষুদ্রাকৃতির মূর্তিও পাওয়া গেছে। এই বিহারে প্রাপ্ত মূর্তি সংখ্যা ৬৩টি।

মহাস্থানগড়

বর্তমান বগুড়া জেলা শহর থেকে ১১ কি.মি. উত্তরে মহাস্থানগড় অবস্থিত। মহাস্থানগড় মূলত একটি প্রাচীন সুরক্ষিত দূর্গ নগরী এলাকা। এর ধ্বংসাবশেষে আনুমানিক ২-৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৫০০ শতক পর্যন্ত ইতিহাসের ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়ে থাকে, মৌর্য যুগের নগর প্রতিষ্ঠার কয়েক শতক পূর্বে এখানে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এতে রামায়ন কাহিনী উৎকীর্ণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ফলকে আলাদা চিত্র অঙ্কিত হয়েছে যা সপ্তম শতকের সংস্কৃত লিপি। এখানে মসৃণ মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। প্রধান প্রধান ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বৈরাগী ভিটা, গোবিন্দ ভিটা, খোদাই পাথর ভিটা, পরশুরামের প্রাসাদ ও সভাবাটী, শীলাদেবীর ঘাট ও লক্ষীন্দরের মেধ অন্যতম।

ময়নামতি

ময়নামতির কুমিল-া জেলায় অবস্থিত। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চল। মূলত ১৮৫৫ সালে এটির খনন শুরু করা হয়। এটি একটি মঠ। ময়নামতির বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন গবেষণা করে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, শিল্প-ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। বিশ শতকের শুরুতে এই এলাকা ব্যাপক অনুসন্ধান করে আমেরিকান পন্ডিত ব্যারি এম মরিসন ১৯৭৪ সালে Lalmai-A Cultural Center of Early Bengal প্রকাশ করেন। ময়নামতি অঞ্চলে এই পর্যন্ড় মোট নয়টি প্রত্নস্থল খনন করা হয়েছে। এগুলো হল; শালবন বিহার, কুটিলা মুড়া, চারপত্র মুড়া, রানীর বাংলো, আনন্দ বিহার, ইটাখোলা মোড়া, রূপবান মোড়া, ভোজ বিহার এবং ময়নামতির ঢিবি। ময়নামতির প্রাপ্ত সিলমোহর থেকে জানা যায় যে, শালবন বিহারের নাম ভবদেব মহাবিহার ছিল। এখান থেকে প্রচুর শিলালিপি, মুদ্রা ও পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। ময়নামতি থেকে প্রায় ৪০০ মুদ্রা পাওয়া গেছে। এগুলো গুপ্ত দেব ও খড়গদের স্বর্ণ মুদ্রা। শালবন বিহারে ক্ষুদ্রাকৃতি ব্রোঞ্চের তৈরি প্রতিমূর্তি পাওয়া গেছে। ময়নামতিতে যে পরিমাণ প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে তা সম্ভবত উপমহাদেশের অন্য কোন প্রত্ন এলাকায় পাওয়া যায়নি। ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী কমপক্ষে পাঁচটি রাজ বংশকে পরিচয় করিয়ে দেয়। এগুলো হল; গুপ্ত, খড়গ, দেব, চন্দ্র, পরবর্তী দেব। ময়নামতির আবিষ্কার ৬ থেকে ১৩ শতকের দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের ইতিহাসের সঠিক ধারণা দেয়। এখানে প্রাপ্ত পাথরের তৈরি দন্ডায়মান বৌদ্ধমূর্তি বাংলাদেশে প্রাপ্ত একমাত্র ধ্রুপদী যুগের গুপ্ত ভাস্কর্যের একমাত্র উদাহরণ। এছাড়াও ১৯৯৪ সালে এখান থেকে আনুমানিক ১০-১১ শতকে নির্মিত ১.৫ মিটার উচ্চতার একটি ব্রোঞ্জের ব্রঞ্জমূর্তি পাওয়া গেছে।

ওয়ারী-বটেশ্বর

বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসে ওয়ারী-বটেশ্বর একটি নতুন সংযোজন। ওয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন এবং সর্বশেষ আবিস্কৃত প্রত্নতত্ত্ব স্থান। এটি নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায় অবস্থিত। ওয়ারী ও বটেশ্বর দুটি গ্রামের নাম। ধারণা করা হয়, এটি চতুর্থ থেকে তৃতীয় খ্রীষ্টপূর্বে মৌর্য পূর্ব যুগের বসতির উদাহরণ। ওয়ারী-বটেশ্বর বেশ কয়েক

মাইল এলাকা ঘিরে যে মুদ্রা এবং অন্যান্য প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে তা ঐ অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব প্রকাশ করেছে। সমুদ্র বাণিজ্যের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল তা প্রমাণিত। ওয়ারী-বটেশ্বর ইতিহাস এখনো অসম্পূর্ণ এবং তা উন্মোচিত হতে আরো অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে। বর্তমানে এর খনন কার্য চলছে।

পাঠ সংক্ষেপ

এদেশের ইতিহাস প্রাচীন। বিভিন্ন সময়ে শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করেছেন। এসব স্থাপনার সাথে এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এদেশের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- পাহাড়পুর, ময়নামতি, মহাস্থানগড়, ওয়ারী-বটেশ্বর ইত্যাদি। এই স্থাপনাগুলো কালের সাক্ষী হয়ে সে সময়কার জীবন চরিত্র তুলে ধরছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.৫

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. মহাস্থানগড় কোথায় অবস্থিত এবং কেন বিখ্যাত?
২. ওয়ারী-বটেশ্বর সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ-৬ : লোকজ জ্ঞান ও সংস্কৃতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- লোকজ জ্ঞান ও সংস্কৃতি কি তা জানতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের লোকজ জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবেন।

লোকজ জ্ঞান ও সংস্কৃতি মূলত পল্লীবাসীর মৌখিক ধারার সংস্কৃতি ও জ্ঞান। যুগ যুগ ধরে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে এগুলো চলে এসেছে। লোকজ জ্ঞান ও সংস্কৃতি মূলত অতীত পল্লীসমাজের অভিজ্ঞতার বাস্ড়বরূপ। লোকজ জ্ঞান ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসে লোকসাহিত্য প্রসঙ্গ। লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির একটি জীবন্ড় ধারা, যাকে জনপদে হৃদয় বলবর বলে আখ্যায়িত করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লোকসাহিত্যের প্রধান ধারাগুলো হল: লোকসঙ্গীত, গীতিকা, লোককাহিনী, লোকনাট্য, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধাঁ ও প্রবাদ।

লোকসঙ্গীত মূলত এলাকা ভিত্তিক বা সম্প্রদায় ভিত্তিক হয়ে থাকে। পল্লীর নিরক্ষর জনগণই এর প্রধান বাহক। জারী গান, সারী গান, গম্ভীরা গান, ধুয়া, অন্ড়রা, লেটোগান, যাত্রাগান, হেরুয়া ইত্যাদি লোকসঙ্গীতের উদাহরণ। লোকসঙ্গীতের অবয়ব ছোট-বড় উভয়ই হতে পারে। পেশাদার-অপেশাদার উভয় ধরনের শিল্পীরাই লোকসঙ্গীত করে থাকে। বয়াতি দল, কবিয়াল, বাউলরা এই ধরনের গান করে থাকে। মাঠে-ঘাটে রাখাল, নদী-হাওরে মাঝি-মাল্লারা মনের আনন্দে গলা ছেড়ে লোকসঙ্গীত করে থাকে। লোকসঙ্গীতের উপজীব্যতায় ভিন্নতা দেখা যায়। এখানে লৌকিক বা পার্থিব প্রেম থেকে শুরু করে অলৌকিক বা অপার্থিব প্রেমের কথা তুলে ধরা হয়। আবার ধর্মীয় সংস্কার আচার-ব্যবহারমূলক বিচিত্র লোকসঙ্গীত রয়েছে। ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত হতে ফসল রক্ষার্থে ও ঝা শিলারিলা শিঙ্গা বাঁজিয়ে ও মন্ত্রধর্মী গান গেয়ে মেঘ তাড়াত। হিন্দু সমাজে দেব-দেবীকে উদ্দেশ্য করে এবং মুসলমান সমাজে পীরের উদ্দেশ্যে করে লোকসঙ্গীত রয়েছে। মুসলমান ধর্মে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মহররম উপলক্ষ্যে লোকসঙ্গীত গেয়ে থাকে। শ্রম ও কর্মের সাথে জড়িত লোকজন কর্মসঙ্গীত করে থাকে। ধান-পাট কাটা, ধান-ভানা ইত্যাদি কাজের সময় কর্মসঙ্গীত করা হয়ে থাকে। এছাড়া পটের চিত্রানুযায়ী গান গাওয়া হয়ে থাকে। পটুয়া সঙ্গীতে ভাব নয়, চিত্রের বর্ননা করা হয়ে থাকে। বর্ষাকালে নৌকার বহরে গ্রামে-গঞ্জে বেদেরা ঘুরে বেড়াত। সাপ ধরা বা সাপের খেলা দেখানো এবং ওঝাগিরি তাদের প্রধান জীবিকা ছিল। সাপ ধরা এবং ওঝাগিরির সময় তারা নানা ধরনের সঙ্গীতের অবতারণা করত। বিভিন্ন উৎসবে গ্রামে পুতুল নাচের আয়োজন করা হয়ে থাকে। পুতুল নাচের ঘটনা বর্ণনায় নানা ধরনের লোকগানের অবতারণা করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পাচালি, কীর্তন ইত্যাদি গান পরিবেশিত হয়। এছাড়াও কবি গান, সারিগান ও মেয়েলী গীত বাংলা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। নর-নারীর প্রেম নিয়ে গীতিকা বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। দেওয়ানা, মদিনা, মহুয়া, ফুলকুমারী, বেহুলা সুন্দরী ইত্যাদি গীতিকা বিয়োগাত্বক পালাগান হিসেবে তুলে ধরা হয়। পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী লোককাহিনীর জন্ম হয়েছে। লোককাহিনী মূলত আরব-পারস্য ভিত্তিক রোমাঞ্চ কাহিনী। আলি-বাবা ও চলি- শ চোর, হাতেম তাই, সিন্দাবাদ পারস্যের কাহিনী। এছাড়া দেশে রূপভান, চন্দ্রাবতী ইত্যাদি কাহিনী রয়েছে। যাত্রাপালা বাংলার লোকনাট্যের একটি উলে- খযোগ্য স্থান দখল করে আছে। শীত ঋতুতে দেশের বিভিন্ন স্থানে পুরাণ, ইতিহাস, লোককাহিনী ভিত্তিক যাত্রা অনুষ্ঠিত হয। ছড়া শিশুতোষ রচনা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে রয়েছে। গ্রামের মানুষের কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি থেকে মন্ত্রের উদ্ভব। মন্ত্রের মাধ্যমে ফসল রক্ষা, শরীর বন্ধন বা ঘরে চোর বন্দী করে রাখা হয়। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের ক্ষেত্রে মন্ত্র আলাদা হতে দেখা যায়। প্রয়োজন ছাড়া যখন তখন মন্ত্র উচ্চায়িত হয় না।

অতীতকাল থেকে উপমা-রূপক প্রতীকের সাহায্যে রহস্যপূণ্য প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর জানতে চাওয়া হত। একে ধাঁধাঁ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ধাঁধাঁয় মূলত উপস্থিত বুদ্ধি যাচাই করা হয়। এটি লোকসাহিত্যের অতি প্রাচীনতম একটি শাখা। ধাঁধাঁর মত প্রবাদও লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম একটি শাখা। সব ধরনের বাংলা লেখায় কম-বেশি প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। প্রবাদ মূলত অভিজ্ঞতালব্ধ বৌদ্ধিক রচনা। রূপক ও হাস্যরসাত্বক হিসেবে প্রবাদ ব্যবহৃত হলেও এর অন্তর্নিহিত অর্থ-অত্যন্ড় ব্যাপক। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। কৃষিজীবি সমাজে খনার বচন খুবই পরিচিত। খনার বচন সমূহে কৃষি কাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করে থাকে।

পাঠ সংক্ষেপ

বাঙ্গালি জাতির গৌরবোজ্জল সম্পদ লোকজ জ্ঞান ও সংস্কৃতি। এদেশের সাধারণ মানুষ তাদের স্বভাবসুলভ চরিত্রে সংস্কৃতির এই ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। লোকজ সংস্কৃতির মধ্যে অন্যতম হলো লোকসঙ্গীত, গীতিকা, লোককাহিনী, লোকনাট্য, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা ও প্রবাদ-প্রবচন। আবার লোকসঙ্গীতের মধ্যে রয়েছে জারীগান, সারীগান, গম্ভীরা, লেটোগান, যাত্রাগান, হের্য়া ইত্যাদি। লোক সংস্কৃতির এসব ধারা-উপধারা এদেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন:৭.৬

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. লোকজ সংস্কৃতি বলতে কি বুঝায়?

২. লোকসংস্কৃতিতে যাত্রাপালার গুরুত্ব এবং বর্তমান অবস্থান সংক্ষেপে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের লোকজ জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।